দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ১০ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | ফেব্রুয়ারি ২০১৬

জানা অজানা

গাছেরা কি কথা শোনে?

গাছ কি মানুষের কথা শুনতে পায়? এমন প্রশ্ন খুব অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু কারও মনে যদি এ জিজ্ঞাসা দানা বাঁধে, তা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়ার নয়। গাছ আলো চিনতে পারে, তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অনুভব করে, তাদের শরীরে কোনও কিছুর স্পর্শও তারা নিজেদের মত টের পায়। তাহলে গছের সঙ্গে কথা বললে তারা কি আমাদের স্বর শুনতে পায়? সম্প্রতি বিবিসি ফেসবুকে এই প্রশ্ন করেছিল। তার উত্তরে অনেক ব্যক্তি তাঁদের মত জানিয়েছেন, সঙ্গে বলেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাও। আমদের কথা তারা 'শুনতে' পায় কিনা এটা বলা না গেলেও, তাঁরা সকলেই এটা বলেছেন যে গাছের সঙ্গে কথা বললে বা তাদের কাছে বসে গান গাইলে, অথবা বাজনা বাজলে তাদের মধ্যে কিছু শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এটা আগেই দেখা গেছে যে, শুঁয়োপোকা পাতা চিবলে যে শব্দ হয় তা যদি রেকর্ড করে গাছের কাছে বাজান হয়, তাহলে তাদের শরীরে পোকা তাড়ানোর পদার্থ তৈরি হতে থাকে। অর্থাৎ তারা তাদের 'কান' দিয়ে সে আওয়াজ 'শুনতে' পায়।

বিবিসি-কে একজন জানিয়েছেন প্রতি সপ্তাহে তাঁর ঘরে রাখা ইয়ুক্কা গাছের পাতা ধুয়ে দেওয়ার সময় উনি গান গাইতেন। দেখা যায় গাছটি খুব তাড়াতাড়ি ২ ফিট থেকে ৭ ফিট লম্বা হয়ে ওঠে। সে এতোটাই বাড়তে থাকে যে তাকে আর ঘরের মধ্যে রাখা সম্ভব হয় নি।

এর পর ৪ পাতায়

মশা: কিছু মন্দ, বেশিই ভাল

জিকা বহনকারী মশারা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, কিন্তু সব মশাই খারাপ নয়

তারা থাকবে না কি তাদের একেবারে নির্বংশ করে ফেলা হবে তাই নিয়ে প্রবল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছ বিশ্ব জুড়ে। যদিও আকারে খুবই ছোট্ট, দু'আঙুলেই তাকে টিপে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী হিসেবে চিহ্নত সেই মশার ভয়েই সারা বিশ্ব এখন থরহরিকম্প। কারণ এমনিতেই বছরে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় তার বাহিত রোগের সংক্রমনে। তার ওপর 'জিকা' নামে এমন এক ভাইরাস সে বহন করছে যে, দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মানো হাজার হাজার শিশুর মস্তিষ্কের ত্রুটির জন্য তাকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা। ফলে সে আদৌ আর পৃথিবীতে ঠাঁই পাবে কি না তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছে।

জীববিজ্ঞানী অলিভিয়া জাডসন'র মতো কেউ কেউ মনে করছেন, ওই জীবাণুবাহিত মশাদের এই ধরা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই উচিত। তাহলে বছরে অন্তত ১০ লক্ষ প্রাণ আমরা বাঁচাতে পারব। কিন্তু এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে এই কারণে যে, নানা জ্ঞাতি গোষ্ঠী মিলিয়ে এখন পর্যন্ত জানা মশক প্রজাতির সংখ্যা ৩৪০০। যার মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। গাছ-পাতা-ফুল-ফলের মধুর ওপরই নির্ভর তাদের জীবনযাপন। এবং সমগ্র মশককুলের মাত্র ৬ শতাংশ প্রজাতিই মানুষের রক্ত সম্পর্কে আগ্রহী। তবে তাদের মধ্যেও আবার সকলে নয়, কেবল নারী বাহিনীই মানুষের পক্ষে বিপদজনক। যারা নিজেদের ডিমকে পুষ্ট করে তোলার জন্য আমাদের রক্ত শুষে নেয়। এবং ওই রক্তচোষাদের মধ্যে অর্ধেক বহন করে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, পীত জ্বর ও জিকা'র মতো জীবাণু।

ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এবং অক্সিটেক ফার্ম পরীক্ষামূলক ভাবে এডিস ইজিপ্টি, যে প্রজাতির মশা জিকা ও ডেঙ্গু'র জীবাণু বহন করে, তাদের মধ্যে পুরুষ মশাদের জিন বদলে দিয়েছেন। দেখা গেছে ওই জিন পরিবর্তিত পুরুষ মশারা এমন একটি জিন বহন করছে যে তাদের ছানারা ঠিকমত বড় হয়ে উঠতেই পারছে না। এবং তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের আগেই তারা মরে যাচ্ছে। ফলে তাদের মাধ্যমে ওই মারণ জীবাণু বাহিত হওয়ার পথটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এই জিন পরিবর্তিত প্রায় ৩০ লক্ষ মশাকে কেম্যান দ্বীপে ২০০৯ - ২০১০ সালে ছাড়াও হয়েছিল। দেখা গেছে আশপাশের অঞ্চলের থেকে সেখানে ৯৬% মশা কমেছে। এবং ব্রেজিলে যেখানে ওই জিকা জীবাণুর আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে এই পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে মশা কমেছে ৯২%। তাই ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গবিশারদ ফিল লয়নিবস মনে করেন, মশাদের নির্বংশ করলে প্রকৃতিতে তার যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা একেবারেই কাম্য নয়। কারণ তিনি বলছেন, মশারা মূলত

আরও এক ডজন

প্রকৃতি মাঝে মাঝেই তার ভান্ডার থেকে নতুন কিছু উপস্থিত করে মানুষের সামনে, আর তাকেই আমরা বলি আবিষ্কার। এই কিছু দিন আগে

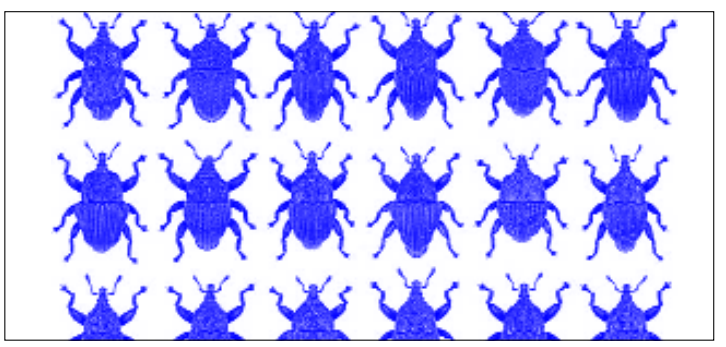

অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে পাওয়া গেছে ২৪ নতুন প্রজাতির বিট্‌ল বা গুবরে ধরনের পোকা। এদের কথা আগে কেউ জানত না।

অস্ট্রেলিয়ার অনেকটাই রুক্ষ, যেখানে আছে শুষ্ক প্রান্তর আর বিস্তীর্ণ 'সাভানা' বা বড় বড় ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত সমতল ভূমি। কিন্তু এ ছাড়াও আছে বর্ষারণ্য, দেশটির পূর্ব দিকে, সমুদ্রের কাছে। সেখানকার নিবিড় জঙ্গলে বাস করে নানা ধরনের প্রাণী। আর সেখানেই পাওয়া গেছে ওই দু'ডজন অজানা গুবরে।

সূত্র: ইউরেকাঅ্যালার্ট

সাইকেলেই যাওয়া যাবে অনেক দূর

‘সাইকেল চালাও, পৃথিবী বাঁচাও’ – এটাই বোধহয় আগামী দিনের স্লোগান হয়ে উঠতে চলেছে। কারণ পৃথিবী জুড়ে যে দূষণ জমা হচ্ছে আকাশে বাতাসে তার জন্য পেট্রল বা ডিজেল চালিত যানবাহন অনেকটাই দায়ী। আর ভারতের শহরগুলিতে গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাতাসও ভীষণ ভাবে বিষিয়ে উঠছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে ভারতের ১৩ শহরের বাতাস বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে আবার রাজধানী দিল্লির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ।

দিল্লির বাতাস এখন এতোটাই দূষিত, যে সেখানে মানুষের মধ্যে নিঃশ্বাসের অসুখ দিন দিন বেড়ে চলেছে। বাতাস দূষণমুক্ত করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও লাভ হয়নি কিছু। বরং গাড়ির সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। তাই শেষমেশ দিল্লির সরকার জোড়-বেজোড় নীতি চালু করে। অর্থাৎ, একদিন রাস্তায় চলবে জোড় নম্বরের গাড়ি, আর তার পরের দিন বেজোড় সংখ্যার। তবে দু চাকার বাহন আর বাস এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়। জানুয়ারির ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত চলে এই পরীক্ষা।

এর ফল কী হল তা এখনও ঠিকঠিক জানা যায় নি। তবে বলা হচ্ছে দূষণ একটু হলেও কমেছে। অবশ্য তা দিয়ে হয়ত শহরের স্বাস্থ্য ফিরবে না। বলা হচ্ছে দূষণ কমানোর আরও নানা পথ বার করতে হবে।

লন্ডনে সাইকেল

প্যারিসে সাইকেল

আর তাই দক্ষিণ দিল্লির পৌর সংস্থা সাইকেলের দিকে নজর ফিরিয়েছে। লোকে যাতে গাড়ি, বাস, মোটরসাইকেল, স্কুটারের বদলে আরও বেশি সাইকেল ব্যবহার করে তার জন্য সাইকেল ভাড়া করার নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে তার জন্য চাই রাস্তায় সাইকেলের জন্য আলাদা ‘লেন’, সাইকেল রাখার আলাদা স্ট্যান্ড, আর ভাড়া মেটানর সহজ উপায়।

চলার পথে দেখা

ভারতে সাইকেলের মত দূষণহীন যান এখনও অবহেলিত। বড় বড় রাস্তায় সাইকেল চালানোর অনুমতিই নেই। কোনও রাস্তাতেই সাইকেলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা থাকে না। তাই দুর্ঘটনা ঘটে মাঝে মাঝে। অথচ ইয়োরোপের শহরগুলিতে সাইকেল এখন এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সেখানে বহু মানুষ মাথায় হেলমেট পরে সাইকেল চালিয়ে, অফিস যান রোজ। চলে প্যাডেল-চালিত সাইকেল, যন্ত্রচালিত বড় বড় বাস, দ্রুতগামি ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকৃতির গাড়ি। ফুটপাথে হাঁটে পথচারি। হাইওয়েতেও চলে সাইকেল। পাশ দিয়ে ১৫০ কিমি গতিতে ছুটে চলে যায় পেল্লায় ডবলডেকার বাস। কোথাও কোনও বিভ্রাট ঘটে না। শোনা যায় না গাড়ির হর্নের শব্দ। সেখানে যান চলাচল আর পথচারির যাতায়াত এতোটাই সুশৃঙ্খল যে হর্ন বাজানোর প্রয়োজন হয় না। যেমন, লন্ডনের মত জনবহুল, কর্মব্যস্ত শহরে ১০ দিন ধরে নানা দিকে ঘুরে বেড়ানোর সময় গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে ছিলাম মাত্র তিন বার। এমন নয় যে সে শহরের সব রাস্তা খুব চওড়া। বেশির ভাগই পুরনো দিনের। দু সারির গাড়ি আসা যাওয়া করেতে পারে, তার বেশি নয়। অনেকটা কলকাতার মতই। প্যারিস শহরেও প্রায় একই অভিজ্ঞতা। হর্নের কোনও কাজ নেই সেখানে। অথচ দু শহরেই সাইকেল চলে প্রচুর, ব্যস্ততম এলাকাতেও। তবে প্রায় সব সাইকেলেই আছে গিয়ার। ফলে সেগুলি বেশ দ্রুতগামী। আবার সাইকেলের আছে নানা রকমফের। কোনওটার চাকা বেশ ছোট তো কোনওটা আবার মুড়ে ভাঁজ করে ট্রেনের কামরায় বা বাসের মধ্যে তুলে নেওয়া যায় অনায়াসে। আছে সাইকেল ভাড়া দেওয়ার কোম্পানি। শহরজুড়ে ছড়িয়ে তাদের সাইকেল স্ট্যান্ড। গ্রাহকরা অগ্রিম ভাড়া জমা দিয়ে কার্ড করিয়ে নিতে পারেন। বৈদ্যুতিন যন্ত্রে কার্ড ঠেকিয়ে স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল নিয়ে চলে যেতে পারেন নিজের গন্তব্যে। সেখানে পৌঁছে, সেখানকার স্ট্যান্ডে সাইকেল রেখে দিলে কার্ডের মারফৎ মিটে যায় ভাড়া। আর কোন সাইকেল কোথায় আছে তা সবই বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে নথিভুক্ত হতে থাকে কোম্পানির কম্পিউটারে। ফলে তাদের সাইকেল খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উন্নত দুনিয়া সাইকেলে সওয়ার হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চাইলে আমরাও পারব।

অনীশ গুপ্ত

মশা মাত্রই খারাপ নয়

১ পাতা থেকে

উদ্ভিদের মধু খেয়ে বাঁচে এবং পরাগমিলন ঘটানোয় তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মশারা পাখি বাদুড়দের খাদ্য। আবার ব্যাঙ ও মাছের খাদ্য মশার লার্ভা। তাই তারা নির্বংশ হলে এই গোটা খাদ্য শৃঙ্খলের ওপরই তো কুপ্রভাব পড়বে।

জাডসন অবশ্য বলছেন যে, ‘খাদ্য ও পরাগমিলনকারী হিসেবে মশার জায়গা অন্য কোনও কীট পতঙ্গ ঠিকই পূর্ণ করে দেবে।’ কিন্তু ‘সেই মশার জায়গা দখল করা পোকা মাকড় জনস্বাস্থ্যের পক্ষে যে আরও বড় সমস্যা ডেকে আনতে পারে এবং মশারা যে হারে জীবাণু ছড়াচ্ছে তার থেকে আরও ব্যাপক হারে, আরও দ্রুত বেগে রোগ ছড়াতে পারে তারা’। এই বলে সতর্ক করেছেন লয়নিবস।

বিজ্ঞান-লেখক ডেভিড কুয়ামেন মনে করেন, প্রকৃতিতে মানুষের ওপর মশার ধ্বংসাত্মক প্রভাব খুবই সীমিত। যদিও মশারাই মূলত ক্রান্তীয় বর্ষারণ্যকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে রেখেছে। যে অরণ্য পৃথিবীর বৃহদংশ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল। কিন্তু মানুষের বিপুল ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ফলে সেই অরণ্যই তো এখন হুমকির মুখে। এবং যে অরণ্য মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার নানা রসদ আজও জুগিয়ে চলেছে সেই অরণ্য ধ্বংস প্রতিরোধে গত ১০ হাজার বছরেও কিছুই করা হয় নি।

কেউ কেউ তাই মনে করছেন, যে প্রজাতিটি মানুষের পক্ষে বিপদজনক, তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, যেখানে মানুষ নিজেই পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি। তবে সম্পূর্ণ অজান্তে, অনিচ্ছাকৃত ওই সব মারণ জীবাণু বহনকারী মশারা থাকবে কি থাকবে না - তা নিয়ে বিতর্ক এখনও বহু দিন চলবে। চলবে তাদের নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও। কিন্তু মশককুল তো বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এই ভেবে যে, কোটি কোটি বছর ধরে এবং মানুষেরও অনেক আগে থেকে বসবাস করা তাদের এই প্রিয় নীলগ্রহকে সত্যি সত্যি না চিরতরে ছেড়ে চলে যেতে হয়।

মালবী গুপ্ত, সূত্রঃ বিবিসি

কূর্ম অবতার

আমাদের পুরাণ কাহিনিতে সে কূর্ম অবতার হিসেবে পূজিত। তাই ভারতের সমুদ্রোপকূলে বেশিরভাগ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ই তার ডিম ও মাংস খায় না। এবং বোধহয় সেই কারণেই ভারতের ওড়িশা উপকুলই পৃথিবীর বৃহত্তম ও নিরাপদ প্রজনন ক্ষেত্র তাদের। সমুদ্র কচ্ছপদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এই প্রজাতির মেয়ে কচ্ছপরা প্রতি বছর হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে একই জায়গায় ডিম পাড়ার জন্য ফিরে আসে, যেখানে তারা প্রথম ডিম পেড়েছিল। সাগরের জল থেকে লাখ লাখ রিডলেরা উঠে এসে দেড় ফুটের মতো বালির গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। এবং ৪৫-৬৫ দিনের মাথায় সেই ডিম ফুটে বাচ্চারা যখন জলের দিকে হাঁটা দেয় সে এক অনবদ্য দৃশ্য।

ভূস্বর্গ এড়িয়ে যেতে চাইছে বিদেশি অতিথিরা

যে দিন তাদের ডাক শোনা যায়, সে দিন বোঝা যায় গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শীত আসছে। উত্তর ইয়োরোপ আর জাপান থেকে প্রথমে এক এক করে পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে আসে তারা, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বেড়াতে আসে তারা প্রতিবছর। তাদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে উপত্যকার চারদিক।

বলা হয়, এক লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসত এক সময়। এখন তাদের সংখ্যা

বছর বছর কমে যাচ্ছে। শ্রীনগরের চারপাশে যে নানা হ্রদ আছে সেখানেই তারা এসে বসে শীতের মরশুমে। কিন্তু হ্রদগুলি আর আগের মত থাকছে না। তাই পাখিদের আসাও কমে যাচ্ছে। তেমনটাই

মনে করেন সেখানকার পাখিবিশারদরা। তাছাড়া আগে আসত প্রায় ২৮ প্রজাতির পাখি, এখন ১৮-র বেশি দেখা যাচ্ছে না।

শ্রীনগরে বিজ্ঞানীরা বলছেন হ্রদগুলি চারপাশে বাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে, জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে হ্রদগুলির জলে, আর সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে কাশ্মীরের আবহাওয়া। তাঁরা মনে করছেন এ সবের ফলেই পাখিরা আসছে কম। তাঁরা বলছেন গত ১০০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, কিন্তু কাশ্মীরের বেশি উচ্চতায় তা বেড়েছে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানকার বিজ্ঞানীরা এও বলছেন যে কাশ্মীরে ঋতু এলোমেলো হয়ে গেছে। যখন যা হওয়ার নয় তখন তা হচ্ছে। তুষারপাত কমছে, বাড়ছে বৃষ্টি।

পাখিরা তাই কম এসে হয়ত জানিয়ে দিচ্ছে ভুস্বর্গ আর তেমন নেই।

সূত্রঃ হিমালয়ান টাইমস

কমলালেবুর চাষ শুরু হয় ২,৫০০ বছর আগে, চিনে

জেনে রাখা ভাল

শীত আসব আসব করলেই যে ফলটির জন্য আমরা প্রায় মুখিয়ে থাকি - কবে বাজারে তার দেখা মিলবে, যে রঙের নামে ফলটিরও নামকরণ - সেই কমলালেবুর চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল চিনে। তার সম্পর্কে আরও জানা যায় যে -

● দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ চিনেই সে প্রথম জন্মায়। পরে চাষ শুরু হয় চিনে, প্রায় ২৫০০ বছর অগে।

●এবং ভারত থেকেই রোমানরা কমলালেবুর গাছ প্রথম রোমে নিয়ে যায় প্রথম শতাব্দীতে। আর উত্তর আফ্রিকাও কমলালেবু ফলাতে শুরু করে ওই প্রথম শতাব্দী থেকেই।

● খ্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯৩ সালে কমলালেবুর বীজ স্পেনের ক্যানারি দ্বীপ হয়ে হাইতি'তে নিয়ে যান। এবং সেখানে কমলালেবুর বাগান তৈরি করেন।

● আর ১৫১৮ সাল নাগাদ পানামা ও মেক্সিকো কমলালেবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে

যায়। এবং এর কিছুদিন পরে ব্রেজিলে কমলালেবুর চাষ শুরু হয়ে যায়।

● অ্যামেরিকার ফ্লোরিডাতে ১৫১৩ সালে প্রথম কমলালেবুর চারা লাগান স্প্যানিস অভিযাত্রী জুয়ান পোনসে ডি লিয়ন।

● কমলালেবু হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বেশি উৎপাদিত লেবু জাতীয় ফল। এবং সব থেকে বেশি কমলালেবু উৎপাদন করে ব্রেজিল।

●আমেরিকার ৭০% কমলালেবু ফলে ফ্লোরিডাতে। যার আবার ৯০% ব্যবহার হয় কমলার রস তৈরিতে।

● পৃথিবীতে চকোলেট ও ভ্যানিলার পর কমলালেবুর ফ্লেভার বা গন্ধই তৃতীয় জনপ্রিয় গন্ধ হিসেবে গণ্য হয়।

● কমলালেবুর মধ্যে এমন ধরনের খাদ্যগুণ আছে যা নানা রকমের ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক হয়।

● কিডনির অসুখ প্রতিরোধে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। পটাসিয়াম ও সি ভিটামিনে ভরপুর কমলালেবু।

● আর নানা খনিজতে সমৃদ্ধ এই ফল আরও কত যে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই বোধহয় কমলালেবুকে কেউ কেউ 'পাওয়ার ফুড'ও আখ্যা দেন।

সূত্রঃ কেয়ার২.কম/গ্রিনলিভিং

গাছ শোনে

১ পাতা থেকে

অপর একজন জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধুর বাবা চমৎকার বাগান তৈরি করেছেন। উনি বলেন, গাছেদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। তাহলে তারা ভাল থাকে।

এই ব্যাপারে অনেকে তাঁদের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। একজনের মত, আমরা যখন কথা বলি বা গান গাই, তখন আমাদের শরীর থেকে বেশি পরিমান কার্বন-ডাইঅক্সাইড বেরতে থাকে, যা গাছেদের প্রয়োজনীয় খাবার। ফলে গাছেরা তরতাজা হয়ে ওঠে। অন্য একজন বলেছে যে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে গাছেদের কাছে সুরেলা বাজনা বাজলে তারা ভাল থাকে আর জগঝম্প বাজনার শব্দে তারা নেতিয়ে পড়ে।এগুলি মানুষের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কী বলছেন? লন্ডনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উলফগ্যাঙ্গ স্টুপ্পি বলেছেন বিজ্ঞানে এখনও এমন কোনও প্রমান পাওয়া যায় নি যে, গান শোনালে গাছেরা ভাল থাকে। তবে সম্ভাবনাটা উড়িয়েও দেন নি তিনি।

তাছাড়া বিশ্বের নানা গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে 'আল্ট্রাসাউন্ড' বা উচ্চ তরঙ্গের শব্দ যা আমরা কানে শুনতে পাই না, তা গাছেদের জীবনকালে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটায়। এও দেখা গেছে যে, ওই শব্দ বীজ থেকে চারা ফুটতে সাহায্য করে। চন্দ্রমল্লিকা গাছের ক্ষেত্রে তা এক ধরনের বিশেষ হরমোনের পরিমান বাড়িয়ে দেয়। ভূট্টার গাছ এক নির্দিষ্ট শব্দ তরঙ্গের দিকে তার শেকড় চালনা করে। আর কোনও কোনও গাছের ক্ষেত্রে গাছের কিছু কিছু জিন বেশি কাজ করেত থাকে এক ধরনের শব্দ হতে থাকলে।

তবে এই ব্যাপারে গবেষণা যত বাড়বে, ততই জানা যাবে আরও অনেক কিছু।

সূত্রঃ বিবিসি

কেমন আছে লাল টুপি পরা পুলিশ?

গাছের গায়ে ক্রমাগত ঠকঠক আওয়াজ অনুসরণ করলে লাল ঝুঁটি মাথায় যে পাখিটি আমাদের নজরে আসে সে আর কেউ নয় - কাঠঠোকরা। ছোটবেলায় যাকে দেখলেই লালটুপি পরা পুলিসের কথা মনে আসত। মিনিটে সে ১০০ বারও গাছে ঠোকরাতে পারে। কিন্তু এতো দ্রুত এবং অত্যন্ত জোরে গাছের শক্ত কাঠ ঠুকরেও সে অক্ষত থাকে কি করে? আসলে তার ঘাড় যেমন শক্ত, তেমনি নমনীয় তার শিরদাঁড়া। সেই সঙ্গে প্রকৃতিই বুঝি তাকে অমন শক্ত ধারালো ঠোঁট আর লম্বা জিভ দিয়েছে বসবাসের কোটর তৈরি করা এবং গাছের গর্ত থেকে লুকিয়ে থাকা পোকা খুঁটে খাবার জন্য। অবশ্য শুধু যে খাদ্যের সন্ধানেই তারা গাছে ঠক ঠক করে এমনটা নয়। ওই শব্দের মাধ্যমেই তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সঙ্গী খোঁজে, প্রেমও করে।

প্রায় ২০০ প্রজাতির কাঠঠোকরা আছে পৃথিবীতে। যাদের অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার ও মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বেশির ভাগ কাঠঠোকরাই অরণ্যবাসী। তবে বসবাসের ব্যাপারে তারা বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী মনে হয়। কারণ বড় বড় গাছের ঘন অরণ্য ছাড়াও তাদের কেউ কেউ বাশেঁর বন, ঘাসের জঙ্গল এমনকী মরুভূমিরও বাসিন্দা।

তবে মনে করা হয় এদের মধ্যে আইভরি-বিল্ড উডপেকার ও ইম্পিরিয়াল উডপেকার বা কাঠঠোকরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ গত ৩০ বছর তাদের কোথাও দেখা যায় নি। এবং যারা আছে তাদের মধ্যেও অনেকে হুমকির মুখে। কেউ বা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অনেক পাখি প্রেমী পর্যটককেই ঘাড় উঁচু করে বনে বনে কাঠঠোকরার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আসলে সব প্রজাতির কাঠঠোকরা দল বেঁধে থাকে না। কেউ কেউ একাকী বিচরণ করতে ভালবাসে যারা স্বজাতিদের প্রতি যেন একটু মারমুখিই থাকে। আবার কেউ দলেও থাকে।

বিপন্ন যারা

জীবিত বা মৃত গাছে থাকা নানা ধরনের পোকামাকড়ই তাদের প্রধান খাদ্য। তবে কিছু ফল, বাদাম জাতীয় জিনিস, পিঁপড়ে, অন্য পাখির ডিম গিরগিটিও তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে। আইভরি বিল্ড উডপেকারই আকারে সব থেকে বড়, ১৯-২১ ইঞ্চি লম্বা। সাদা-কালো-লাল-হলুদ-কমলা-সবুজ-বাদামি-মেরুন-সোনালি কত রকম রঙের যে হয় কাঠঠোকরারা-সে যেন এক বিস্ময়। প্রকৃতিতে থাকা কাঠঠোকরা বাঁচে সাধারণত ৪-১১ বছর।

সূত্রঃ উইকিপিডিয়া, ডিফেন্ডারস.অরজ/উডপেকার

সান্ত্বনা দেয়, দিয়ে চাঙ্গা করে অন্যরা

হাতি, ডলফিন, কুকুর – এরা যে বুদ্ধিমান প্রাণী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর গবেষণা থেকে এও জানা গেছে যে এরা সমাজবদ্ধজীব, যারা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকে। কেউ যদি বিপদে পড়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, এমনকী নিজেদের দলের কোনও সদস্য মনমরা হয়ে থাকলে, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মন ভাল করার চেষ্টা করে। জীববিজ্ঞানীদের মতে তাদের এই সহানুভূতিশীল আচরণের পেছনে কাজ করে এক বিশেষ 'হরমোন' বা শরীরের পদার্থ যা মনের মধ্যে ভালবাসা, সহমর্মিতা, বা অন্যের উপকার করার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে। এই হরমোনটির নাম 'অক্সিটোসিন', আর তা আছে মানুষের

ইঁদুরের মনের কথা

শরীরেও। এমনকী এক ধরনের ইঁদুরেও। এই ইঁদুরগুলির নাম 'প্রেরি ভোল'। বাংলায় তাদের 'মেঠো ইঁদুর' বললে ভুল হবে না। কারণ, এরা বড়বড় ঘাসে-ঢাকা খোলা প্রান্তরেই বাস করে। একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে এক একটি গোষ্ঠী। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে এদের মধ্যে কারও যদি আঘাত লাগে বা কোনও কারণে দলের কোনও সদস্য যদি ভয় পেয়ে থাকে, তাহলে অপর একজন এসে তার শরীর চেটে তাকে সান্ত্বনা দেয়, মনোবল যোগায়। অবশ্য নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই এমন আচরণ লক্ষ করা যায়। অন্য কোনও জায়গার, অপরিচিত কোনও দলের সদস্যের প্রতি ততটা সহনাভুতিশীল নয় তারা। আবার এও দেখা গেছে যে অসহায় কোনও সদস্যকে আদর করে গা চেটে দিতে না পারলে বাকি সদস্যরা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। যেন কিছু করতে না পারার জন্য অনুশোচনা হয় নিজেদের মধ্যে। তাদের এই সব আচরণ ধরা পড়েছে জীববিজ্ঞানী জে.পি. বারকেট ও তাঁর সহবিজ্ঞানীদের গবেষণায়, যাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্স' জার্নালে।

সূত্রঃ সায়েন্সডেইলি

পশ্চিমঘাটের আম সাম্রাজ্যে জোর লড়াই

এখন বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। আমের গাছে মুকুল এসেছে ইতিমধ্যেই। ফলের রাজার আবির্ভাব ঘটতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। কিন্তু আম সাম্রাজ্যে সব কিছু যেন আর ঠিকঠাক নেই। আমে আমে চলছে রেষারেষি ও আগ্রাসন। কে হবে সম্রাট, রাজাধিরাজ, তাই নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের আমের জগতে শোনা যাচ্ছে নানা ষড়যন্ত্রের কথাও। আর এর পেছনে নাকি হাত আছে এক শ্রেণীর মানুষের।

মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এক বিশেষ আমের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে। আমটির নাম 'আলফান্সো'। ভারতে পোর্তুগিজ উপোনিবেশ স্থাপন করেন সে দেশের এক সেনাপতি, আলফান্সো ডি আলবুকার্ক। ভারতে এসে আম খেয়ে মুগ্ধ হয়ে উনি আম নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং এমন এক কলমের গাছ তৈরি করায় সাহায্য করেন যার ফল হয় অতি সুস্বাদু। তাঁর নামেই ওই নতুন ধরনের আমের নামকরণ হয়, 'আলফান্সো'। শোনা

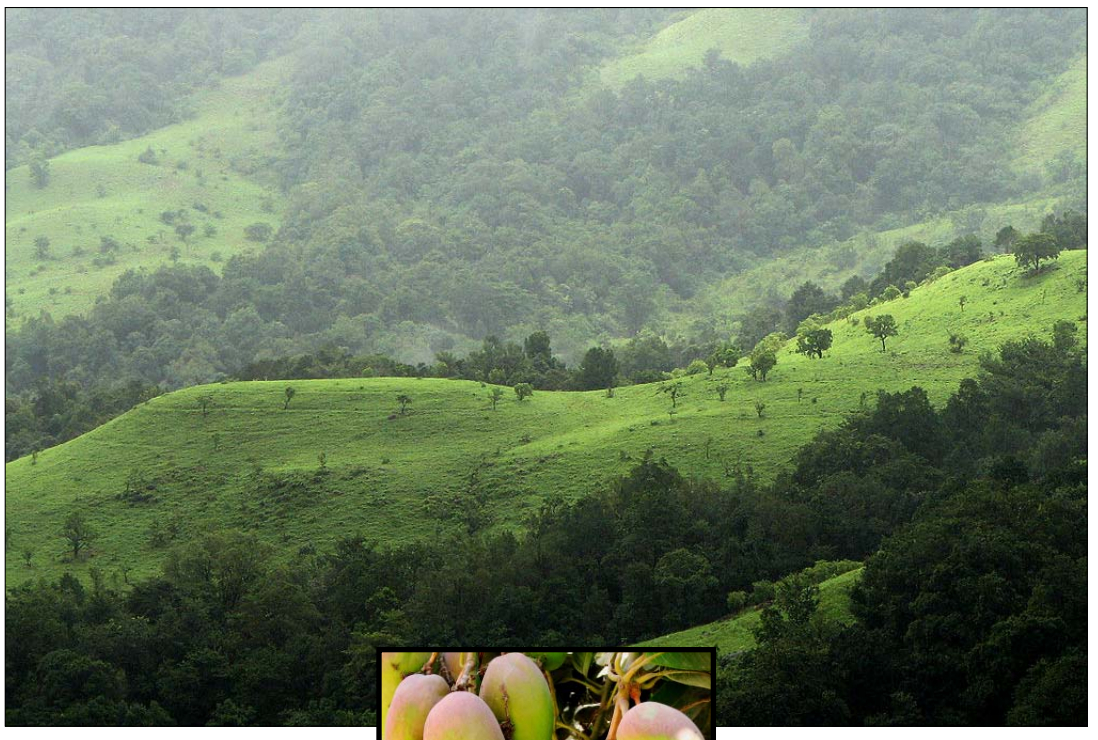

এখন কে হবে রাজা?

যাচ্ছে, এখন ওই আলফান্সোই অন্য অনেক ধরনের আমকে শুধু যে জমিচ্যুত করছে তাই নয় বরং তাদের বিলুপ্তির দিকেও ঠেলে দিচ্ছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা জুড়ে ছড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্রের ১২ জেলা। সেখানকার স্কুলগুলিতে রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের 'ইকো ক্লাব' বা পরিবেশ ক্লাব। ওই স্কুল পড়ুয়াদের ক্লাবগুলি এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে অঞ্চলে আছে প্রায় ২০৫

প্রজাতির আম। গ্রামগুলিতে প্রায় সব বাড়ির বাগানে, রাস্তার ধারে, বাঁধের গায়ে, মাঠের ধারে কোনও না কোনও স্থানীয় আমের গাছ আছে। আর ওই গাছগুলিতে যে আম ফলে তা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের এবং সেগুলি ব্যবহারও নানা প্রকারের। যেমন, সেখানকার এক বিশেষ আম হল 'ভোপালি'। নামটা এসেছে মারাঠী শব্দ 'ভাপ্পা' থেকে, যার মানে কুমড়ো। ঠিক কুমড়োর মত না হলেও, ওই আম নাকি আকারে খুব বড়। তার খোসা বেশ মোটা, আর পাকার আগেই তার শাঁস খেতে হয় মিষ্টি। ওই আম দিয়ে আচার তৈরি করেন সেখান মানুষজন, আবার স্যালাড হিসেবে কাঁচাও খাওয়া হয় খাবারের সঙ্গে।

অন্য এক আম আবার আকারে খুব ছোট, নাম 'মধঘোটি'। তার রস অতি জনপ্রিয়। বলা হয় তা নাকি মধুর চেয়েও মিষ্টি। আরও এক আম, 'ঝাপল্যা', যার মানে ছায়া। স্বাদে টক-মিষ্টি। এ আম বেশ কিছু দিন রাখা যায়। এর রস খুব সুস্বাদু যা বিশেষ করে উৎসবের সময় পান কারা হয়।

'শেপুআম্বা', এও এক ধরনের আম। তবে স্বাদ নাকি আমের মত না হয়ে অনেকটা সেলারি পাতার মত। এটাই তার বৈশিষ্ট, আর সে কারণেই তার চাহিদা। আর আছে 'খোপরাআম্বা'। এ আমের ভেতরের শাঁস নারকেলের মত। এ সব স্থানীয় আম পশ্চিমঘাটের বাসিন্দারা খুবই পছন্দ করেন, আর তাই বিক্রিও হয় যথেষ্ট। সেখানকার আম চাষিরা বলেন এক একটি গাছ থেকে বছরে আয় হয় পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার টাকা, আর গাছের পেছনে খরচও খুব কম।

কিন্তু সে রাজ্যের সরকার আর বড় বড় আম ব্যবসায়ীরা চাইছেন আরও বেশি আলফান্সো। কারণ, বিদেশে তার কদর বেশি, দামও অনেক। ফলে একটু একটু করে স্থানীয় আম গাছ কেটে সেখানে বসছে আলফান্সোর চারা, তৈরি হচ্ছে তার বাগান। আর সেই সঙ্গে এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমঘাটের নিজস্ব আমের গাছগুলি। **সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ অনলাইন**

দেওয়াল লিখন

২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৬০% মানুষ থাকবে শহরে। বিশ্বে প্রতি সপ্তাহে ১৪ লক্ষ লোক শহরে আশ্রয় নিচ্ছে।

গ্লোবাল কমিশন অন ইকনমি অ্যান্ড ক্লাইমেট

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: February 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● দিনে একটি গরুর দেহ থেকেই এত পরিমানে ক্ষতিকর মিথেন নির্গত হয় যে তাতে প্রায় ৪০০ লিটারের বোতল ভর্তি হয়ে যাবে।

● পৃথিবীতে ১০ হাজারেরও

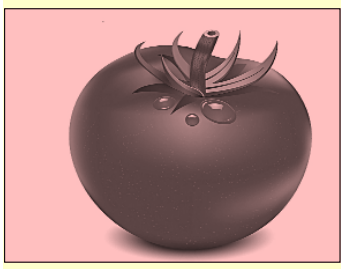

বেশি রকমের টম্যাটো আছে।

● জোনাকিই একমাত্র প্রাণী যে এক ফোঁটা উত্তাপ না ছড়িয়েও আলো ছড়াতে পারে।

● প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশি বার ভূমিকম্প হয়।

● পিঁপড়েদের আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

● অ্যান্টার্কটিকায় বৃহত্তম হিমবাহটি লম্বায় ২৫০ মাইল এবং ৪০ মাইল চওড়ায়।

বাচ্চারা মোটা হচ্ছে

শিশুরা দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। এটা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পৃথিবীর ১০০ দেশে সমীক্ষা চালিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে যে পাঁচ বছরেরও কম শিশুদের অতি বেশি মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবনতা এতোটাই বেড়ে গিয়েছে যে তা এখন মহামারির আকার ধারণ করেছে বলা যেতে পারে।

গবেষকরা বলেছেন শিশুদের মোটা হয়ে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে যা প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা বলছেন পুষ্টিকর খাবারের অভাব, বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বাজারি 'জাঙ্ক' খাবরের প্রচলন, আর কম খেলাধুলো শিশুদের মোটা করে তুলছে। পৃথিবীর সব দেশে এমনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলিতে এই প্রবনতা বেড়েছে পাঁচ গুণ।

এই মহামারি ছড়িয়েছে ভারতেও। জাঙ্ক বা জঞ্জাল খাবারের ব্যবহার এ দেশে হুহু করে বাড়ছে। আগের তুলনায় মানুষ এখন খরচ করতে পারে বেশি । আর তার একটা মোটা অংশ ব্যয় হয় অতি মাত্রায় খাওয়ার পেছনে। একটা খাই খাই মনোভাব যেন গ্রাস করছে সকলকে। তাই বোধহয় বই মেলাতেও খাবার বিক্রেতারা পাল্লা দেন বই বিক্রেতাদের সঙ্গে।

বলা হচ্ছে ২৪ শতাংশ ভারতীয় শিশু এখন মোটা, যা ভবিষ্যতের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। পৃথিবীতে মোটা মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে, তারপর চিনে, আর তৃতীয় স্থানেই রয়েছে ভারত।

সূত্রঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। পয়লা নভেম্বর ১৯৫৯ এর আগে এখনকার মধ্যপ্রদেশের কী নাম ছিল?
(ক) মধ্যাঞ্চল (খ) মধ্য ভারত
(গ) বুন্দেলখন্ড (ঘ) বিন্ধ্যাঞ্চল

২। এলাহাবাদ শহরের এই নাম কে দিয়েছিলেন?
(ক) সুলতান ইলতুতমিস (খ) সম্রাট আকবর (গ) আলাউদ্দিন খিলজি (ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

৩। ফুটবলের জন্য বিখ্যাত কোন দেশের নামের মানে রূপো কিম্বা রূপালি দেশ?
(ক) পর্তুগাল (খ) আর্জেন্টিনা (গ)ক্যামেরুন (ঘ) উরুগুয়ে

৪। বছরের কোন ঋতুতে পোলার বেয়ার বা সাদা ভালুক সব থেকে বেশি জন্মায়?
(ক) গ্রীষ্ম (খ) বসন্ত (গ) শীত (ঘ) শরৎ

৫। চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সবটাই প্রায় পার্বত্য; স্থলভূমিতে বা জমির ওপর দিয়ে কোন দেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত দীর্ঘতর?
(ক) পাকিস্তান (খ) নেপাল (গ) মায়ানমার (ঘ) বাংলাদেশ

৬। উন্নয়নশীল সব দেশ মিলে গর্ভবতী মেয়েদের ২০ শতাংশ খাবারে কিসের অভাবে মারা যান?
(ক) লোহা (খ) জল (গ) প্রোটিন (ঘ) আয়ডিনযুক্ত নুন

৭। কোন পাখি তার মুখে ১৪ লিটার পর্যন্ত জল জমিয়ে রাখতে পারে?
(ক) পেলিকান (খ) পেঙ্গুইন (গ) অ্যালবাট্রস (ঘ) মৎস্যভুক বা মাছ খাওয়া ঈগল

৮। দিল্লি যখন ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হল তখন সেটি কোন রাজ্য বা প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল?
(ক) হরিয়ানা (খ) রাজস্থান (গ) উত্তরপ্রদেশ (ঘ) পঞ্জাব

৯। কোন শ্রেণীর ভগবৎভক্ত সাধুরা প্রধানত পশমের পোশাক পরতেন বলে পশমের আরবি শব্দ থেকে তাঁদের নাম হয়েছে?
(ক) সুফি (খ) দরবেশ (গ) চিস্তি (ঘ) আউলিয়া

১০। কলকাতার কোন জায়গার এক সময় নাম ছিল অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন?
(ক) ময়দান (খ) এসপ্ল্যানেড (গ) ইডেন উদ্যান (ঘ) চিড়িয়াখানা।

উত্তর: ১/খ; ২/খ; ৩/খ; ৪/গ; ৫/ঘ/; ৬/ক; ৭/ক; ৮/ঘ; ৯/ক; ১০/গ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com